বং ঢং ডট কম্
www.bongdhong.com

সবুজ আকাশের নীচে

মৈত্রেয়ী কুমার

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। দেড় বছর যাবৎ ডেনমার্কবাসী হলেও ঠাণ্ডা সহ্য করার ধাত তৈরি হয়নি। তবু চলেছি উত্তর নরওয়ের ট্রমসোতে মেরুজ্যোতি বা অরোরা বোরিয়ালিসের সন্ধানে।

কয়েক শতাব্দি ধরে ট্রমসোর খ্যাতি 'দ্য গেটওয়ে অফ আর্কটিক' হিসেবে। যদিও উত্তর মেরুর দূরত্ব এখান থেকে দু'হাজার কিলোমিটার, তবু মেরু অভিযাত্রীরা সকলেই তাঁদের অভিযান শুরু করেছেন উত্তর নরওয়ের এই ট্রমসো থেকে। এখান থেকেই সাহায্যকারী লোকলস্কর, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, জাহাজ যোগাড় করে তাঁরা হাজির হতেন সোয়ালবার্ড-এ। সোয়ালবার্ড হল উত্তর মেরুর সর্বশেষ জনবসতি। ট্রমসো রয়েছে নর্দার্ন লাইট জোন অর্থাৎ মেরুজ্যোতি অঞ্চলের একেবারে মাঝামাঝি, তাই অরোরা ভালো ভাবে দেখার জন্য এ জায়গাটা অনবদ্য।

বোঁচকাবুঁচকি ভালোই বাঁধতে হল। যা শীত ওখানে। রাত্রের তাপমাত্রা কখনও কখনও মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে যায়। কমপক্ষে তিনটে উলের পোষাকের স্তর পরা প্রয়োজন। সম্পূর্ণ উলের পুরো গা ঢাকা ইনার, বিশেষ ফার বসানো কান-ঢাকা লেদারের টুপি, স্কি গ্লাভস্, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা উলেন মোজা, জিনস্ জাতীয় মোটা প্যান্টের উপরে পরার মতো উইণ্ডচিটার প্যান্ট, স্নো বুটস্, মোটা উলের মাফলার। অসম্ভব ঝোড়ো ঠাণ্ডা বাতাস, প্রস্তুত না থাকলে ফ্রস্ট বাইট হয়ে অসুখ বাধানো অসম্ভব নয়।

আমাদের মতো গরম দেশের লোকেদের অবশ্য এরকম মারাত্মক ঠাণ্ডা জায়গায় যাওয়ার আগে মানসিক প্রস্তুতিরও দরকার আছে, বিশেষ করে এমন ঋতুতে যখন দিন বলে কিছু নেই। গোটা শীতকাল সূর্য এখানে দিগন্তের ওপরে ওঠে না। পাঁচদিনেই আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে গিয়েছিল দিনের আলো না দেখে।

কোপেনহেগেন থেকে ফ্লাইটে ভোর সাড়ে ছটায় রওনা দিয়ে নরওয়ের রাজধানী অসলো পৌঁছলাম। সেখান থেকে ঘণ্টাখানেকের উড়ানে ট্রমসো। ট্রমসোগামী প্লেনের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি শুধু ধূ-ধূ বরফ ঢাকা পাহাড় উপত্যকা। নীল কালচে ধূসর রং চরাচরে।

ট্রমসোতে ভরদুপুরে সন্ধ্যা

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

নরওয়েজিয়ান সী শান্ত পড়ে রয়েছে নীচে। সমুদ্রের জল মাঝে মাঝে খাঁড়ির মতো ঢুকে এসেছে। এগুলোকে বলে ফিয়র্ড। গোটা নরওয়ে ফিয়র্ড-এ ঘেরা। কোথাও কোথাও তিনধার ঘেরা পাহাড়ি উপত্যকার ঢালে ফিয়র্ডের জল ঠাণ্ডায় জমে নানা আকৃতির বরফের নালার মতো হয়ে রয়েছে। এগুলিকে বেষ্টন করে আছে যে উঁচু উঁচু ভূখণ্ড — ঠিক পাহাড় নয়, আবার টিলার মতো ছোটও নয় — সেগুলি পাথর মটি জমে জমে তৈরি, দেখায় যেন খাঁজ কাটা কাঠের মতো। এগুলির চূড়া থেকে নরওয়েজিয়ান সী-এর গাঢ় নীল জলে ঘেরা নরওয়ের উজ্জ্বল শ্যামল অসাধারণ রূপ দেখতে প্রচুর ট্যুরিস্ট আসেন গ্রীষ্মকালে।

শীতেও বরফঢাকা নরওয়ের রূপের তুলনা নেই। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ফাঁকে মাথা তুলে আছে সমুদ্র থেকে খাড়া উঠে যাওয়া দুধসাদা পাহাড়। সেই পাহাড়ের চূড়ায় এক-মাথা বরফের চাঙড় সমেত ছোট ছোট বাড়িঘর। টিমটিমে হলুদ আলো জ্বলছে তাতে। সময় বেলা এগারোটা, কিন্তু বাইরে যেন সন্ধ্যার অন্ধকার।

ছোট্ট এয়ারপোর্ট ট্রমসো। ল্যাগেজ ক্লিয়ার করে বাইরে বেরোতেই যে অনুভূতি হল তা একসঙ্গে আহ্ এবং উঃ। এয়ারপোর্টের সামনেই নরওয়েজিয়ান সাগরের গাঢ় নীল জল। দুরন্ত হাওয়ায় পাড়ে ভেঙে পড়ছে ঢেউ, সাদা ফেনারাশি ছড়িয়ে। দিকচক্রবাল জুড়ে কালচে ঘন নীল পোশাকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘবালিকার দল। কী রং, কী বাহার! সমুদ্রের বাঁ দিকের পাড় ঘেঁষে পর্বতপ্রাচীরের মন্দ্রগভীর রূপ। কিন্তু বাপরে, কী ঝোড়ো বর্ফিলি বাতাস! সঙ্গে কুচো কুচো বরফ পড়ছে। এক লাফে ট্যাক্সির কোটরে সেঁধোতে পারলে বাঁচি।

ছোট দেশ, তায় আবার পাহাড়, ফিয়র্ডস-এ ঘেরা। সমতল কই! কুছ পরোয়া নেই। পাহাড়ের কন্দরে আলোময় মসৃণ সুড়ঙ্গপথে কয়েক মিনিটেই সিটি সেণ্টারে পৌঁছে গেলাম। পথে লোকজন বিশেষ চোখে পড়ল না। বেশিরভাগই খ্রিস্টমাসের ছুটিতে বেড়াতে বেরোয়, যারা পড়ে থাকে তারাও পরিবার নিয়ে উষ্ণ গৃহকোণে স্পেশাল খানাপিনায় মত্ত। আমাদের তিনজনের মতো বীর বঙ্গসন্তান ক'জন, যারা হাড়-কাঁপানো জানুয়ারির দোরগোড়ায় আর্কটিক পোল থেকে দু'হাজার কি.মি. দূরে দাঁড়িয়ে আহ্লাদ করে!

খ্রিস্টমাসের আলোকমালায় সজ্জিত শুনশান ট্রমসোর রাস্তা

ট্রমসোতে হোটেলের অভাব নেই। সারা বছর অগুনতি ট্যুরিস্ট আসে এখানে। এমন হোটেলও আছে যার সঙ্গে রয়েছে বাসনপত্রে সাজানো কিচেন। নিজে রাঁধা যায়, সাশ্রয়ও হয়। আমরাও তাই করেছি। দুপুর একটা বাজে, বেশ আঁধার ঘনিয়েছে। অথচ একবার দোকানে না গেলে নয়, কাল বছরশেষের জন্য দোকানপাট বন্ধ থাকবে, তার পরদিন পড়েছে রবিবার। এদিকে আকাশে একটানা মেঘ-বরফের যুগলবন্দি চলেছে। গ্রসারি শপ থেকে ফেরার পথে রিসেপশনে ধরলাম আমাদের হোটেল-কর্তাকে। মিনমিন করে শুধোলাম, "আলো-ফালো দেখার আর চান্স আছে কি! যা ওয়েদার!"

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

তিনি বললেন, “ডরো মত্। কালই আমার লোকেরা ট্যুরিস্টদের দেখিয়েছে।” হুঁঃ, অরোরা যেন ওঁর পোষা সারমেয়শাবক, তু তু করলেই চলে আসবে! মনে মনে গজগজ করতে করতে আলু-পেঁয়াজের পলিথিন সাবধানে আঁকড়ে বরফঢাকা সিড়ি ভাঙি। এই বয়সে অধঃপতন ঘটলে আর দেখতে হবে না।

নর্দান লাইট বা মেরুজ্যোতি প্রকৃতির এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বলেই অধরা। মানুষ এই আলোকে কেন্দ্র করে ব্যবসা খাটাচ্ছে ঠিকই কিন্তু নতজানু হয়ে স্বীকারও করে নিয়েছে একটি সারসত্য — তুমি এক কাড়ি টাকা ঢেলেছ বলেই যে স্থানীয় ট্র্যাভেল এজেন্টরা তোমাকে আকাশভরা আলো দেখিয়ে দেবে তার কোনও গ্যারাণ্টি নেই। ফ্যাচাং কম নয়, প্রাকৃতিক অনেক কিছুর তাল মেলা চাই।

সূর্য থেকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসা কণার ঝড়ই মেরুজ্যোতি সৃষ্টির মূল কারণ। ওই ঝড় সরাসরি পৃথিবীতে এসে পড়লে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হত। কিন্তু আমাদের বাঁচিয়েছে পৃথিবীকে ঘিরে থাকা চৌম্বকক্ষেত্র বা ম্যাগনেটোস্ফিয়ার, যা একটা বর্মের মতো সূর্য থেকে ছুটে আসা বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত কণাগুলোকে আটকে দেয়। কিন্তু মেরু অঞ্চলে এই কণাগুলো চুম্বকের বলরেখা অনুসরণ করে নেমে আসে নীচে। পৌঁছে যায় বায়ুমণ্ডলের ওপরের দিকে। সেখানে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন অণুর। তারই পরিণতিতে জন্ম নেয় এই প্রায়-অলৌকিক অরোরা। ঘটনাটা ঘরে সচরাচর ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০-১৪০ কিলোমিটার, বা কখনও তারও বেশি উচ্চতায়।

অতএব, শক্তিশালী অরোরার আলো দেখতে হলে সূর্য থেকে ছুটে আসা কণার ঝড়ঝাপটা তেজি হওয়া চাই। আবার তিথিটাও অমাবাস্যা চাই, নিদেনপক্ষে কৃষ্ণপক্ষ, রাতের আকাশ চাই পরিষ্কার। ‘চাই’-এর শেষ নেই। গত ছত্রিশ ঘণ্টায় সূর্যের এক কণা আলো দেখিনি। সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত ভোর-ভোর লাগে, তারপরেই গোটা এলাকা ডুবে যায় অন্ধকারে। বেশ দমচাপা অস্থির ভাব লাগছে। রাস্তার ধারে ১০ সেণ্টমিটারেরও বেশি পুরু বরফ জমে আছে। কোনও কোনও বাড়ির বন্ধ জানলার অর্ধেক অবধি বরফে ঢাকা। বরফ পরিষ্কারের গাড়ি সকালে পরিষ্কার করে দিয়ে গেলেও এখনই এই হাল। জানলার ব্লাইণ্ড তুলে দেখি একটি-দু’টি কালো ভালুকের মতো পোশাক পরা লোক ইতিউতি। আর অবিশ্রান্ত সাদা তুলোর ছোট-বড় গোলা ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে।

কাল আলো দেখার প্রোগ্রাম। আমাদের হোটেলের জানলা থেকে দেখা যায় একটি বিশাল ফিয়র্ড-প্রাচীর, তার মাথায় ভিউ পয়েণ্ট। গরমে কেবল কার নিয়ে ওখানে পৌঁছলে গোটা ট্রমসোর চমৎকার ভিউ পাওয়া যায় বলে শুনেছি। ঘড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের বন্দর এলাকা আর ওই ভিউ পয়েণ্ট থেকে অপূর্ব সব আলোর বাজি হতে থাকল।

ইতিমধ্যে বরফ পড়া কিছু কমেছে। রাতের আকাশে লাল নীল হলুদ বেগুনি সোনালি-রুপোলি হরেক আলোর হরেক আলপনার বাজি দেখতে দেখতে প্রার্থনা করতে থাকলাম এমনই আলোর জাদু যেন কালও দু’চোখ ভরে দেখতে পাই, মনুষ্যকৃত নয়, প্রাকৃতিক।

পয়লা জানুয়ারির নতুন সকাল। ঘুম ভাঙতেই দেখি দশটা বাজে। যথারীতি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রথম কাজ ব্লাইণ্ড হটিয়ে আকাশ দেখা। সেখানে ছাই রঙের চাইতে নীলচে ভাব বেশি। বরফ পড়ছে না। মনে বল পেলাম। সময় নষ্ট না করে ব্রেকফাস্টের আয়োজন সারতে লাগলাম। শীতের পোষাক মাথা থেকে পা পর্যন্ত যা যা লাগবে সব গুছিয়ে রাখতে হবে হাতের কাছে, যাতে শেষ মুহূর্তে কিছু না ভুলি। খোলা আকাশের নীচে প্রায় সাত-আট ঘণ্টা বাইরে থাকতে হবে। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে রাতে তাপমাত্রা মাইনাস চোদ্দো-পনেরো ডিগ্রিতে নেমে যাওয়া আশ্চর্যের নয়। ব্যাকপ্যাকে গুছিয়ে নিতে হবে জলের বোতল, কিছু ড্রাই ফ্রুট, কুকিজ, চকোলেট।

আজ আমরা চলেছি লিংসফিয়র্ড অ্যাডভেঞ্চার নামক একটি দলের সঙ্গে। আমাদের গন্তব্য ফিয়র্ড-এ ঘেরা একটি দ্বীপ। মেরুজ্যোতি ছাড়াও আরও অনেক কিছুর টানে মানুষ এখানে আসে। স্নো স্লেজিং (কুকুর কিংবা রেনডিয়ার-এ টানা গাড়ি), স্নো মোবিল (বরফের পথে প্রান্তরে নিঝুম রাতে মোটরবাইক চালানো), আইস-ফিশিং ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে দেবার বহু সংস্থা আছে। গড়পড়তা এদের সকলেই রাত্রে হট মিল দেয় এবং ইনসুলেটর দেওয়া বিশেষ শীতের পোশাক ও জুতো যোগায়।

সন্ধ্যে পাঁচটা আর রাত বারোটায় তফাত কী! সাড়ে পাঁচটায় মিটিং পয়েণ্টে পৌঁছতে হবে। সাড়ে তিনটে থেকে শরীরে একের পর এক পোশাক চাপিয়ে আয়নায় বেশ অভিযাত্রী-অভিযাত্রী হয়ে উঠলাম। পিছনে তাকিয়ে দেখি আমার বাকি দু’জন সঙ্গীর মুখ চাপা হাসিতে লাল।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাস ছাড়ল। সমুদ্র পড়ে রইল ডান দিকে। আলোর মালায় ঘেরা পোর্ট এলাকা পেরিয়ে পাহাড়ি পথে হু হু করে ছুটতে লাগল বাস। কিছু দূর এগোতেই শুরু হল ঝিরঝিরে বরফকুচি বৃষ্টি। কিন্তু কী আশ্চর্য, মনে কোনও উদ্বেগ এল না। বরং আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগলাম ডানদিকে বাসের কাচের জানলার ওপারে বড় বড় ঝোপঝাড় সমেত জঙ্গুলে ভূমি। পত্রহীন নাম না জানা গাছগুলির সিল্যুট কাচের গায়ে বাসের মানুষজনের প্রতিফলনের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার। বাঁ দিকে চোখ ফেরাই। পুরু বরফের স্তরে ঢেকে আছে পথ। মাঝে মাঝে লোকালয়। কী অপূর্ব আলোর মালায় সাজানো বাড়িগুলো। জানলার ফ্রেমে আলোর বাতি, স্টার, মালা ঝুলছে। কোনও কোনও জানলার কোণে ঝলমলে সজ্জিত খ্রিস্টমাস ট্রি-এর উঁকিঝুঁকি। চমৎকার মোমবাতির স্ট্যাণ্ডে সাজানো বাহারি মোমের আলো। কারও কারও বাগানে সাদা বরফের মাঝখানে থলি হাতে লাল টুকটুকে স্যাণ্টা দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বা তাদের কেউ বয়েসটা কত হল ভুলে অতিরিক্ত অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় হয়ে থলি কাঁধে কোনও বাড়ির জানলায় দড়ি বেয়ে উঠছে। দেখতে দেখতে জনপদ হারিয়ে গেল। যাত্রীদের প্রাথমিক গুঞ্জন এখন অনেকটাই থেমে গেছে। পৃথিবীর নানা প্রান্তের ট্যুরিস্ট আছেন এখানে। জার্মান, স্প্যানিশ, ইংলিশরা তো আছেনই, আছেন অস্ট্রেলিয়ান, আমেরিকান এবং সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার লোকও। সকলেরই আশা দু’চোখ ভরে নর্দান লাইট নিয়ে ফিরবেন, এবং সকলেরই চিন্তা, শেষ অবধি দেখা যাবে তো!

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

সাতটা নাগাদ এক ঘুরঘুট্টি আঁধারের কোলে এসে বাস থামল। এ কোথায় এলাম রে বাবা! মিশকালো অন্ধকারে আকাশ ফুঁড়ে হালকা নীলাভ আলো। একেই কি তারার আলো বলে? সামনে ছোট একটা কাঠের বাড়ি। এটাই এদের বেস ক্যাম্প। সবাই ঢুকলাম। সামনের ঘরে সারি সারি শীতের পোশাক। ডান দিকের ঘরে নাম রেজিস্ট্রেশন সহ পয়সা জমা নেওয়া হচ্ছে। বাঁ দিকের ঘরে সারি সারি স্নো বুট রাখা। আমাদের পরে থাকা পোশাক দেখে এরা একবাক্যে ও-কে বলে দিল বটে, তবে আমার স্বামীর জুতো দেখে গাইড সন্তুষ্ট হল না। তাকে জুতো বদলাতে হল। আমাদের শুধু নর্দার্ন লাইট দেখার প্রোগ্রাম। মাথাপিছু ১২০০ নরওয়েজিয়ান ক্রোনার জমা করে দিলাম।

যার যার অভিরুচি অনুযায়ী দল ভাগ হয়ে গেল। অর্ধেকের বেশি গেল ডগস্লেজিং-এ। বাকি গেল রেনডিয়ার স্লেজিং-এ বা স্নো মোবিলের মতো অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে নর্দার্ন লাইট দেখার অভিজ্ঞতা কুড়োতে। হারাধনের গুটিকয় বেঁচে যাওয়া ছেলের মতো আমরা ক'জনা আমাদের তালঢ্যাঙা গাইড ক্রিস্টিয়েনসেনের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক এবং পারস্পরিক নাম বিনিময় করে হাঁটা লাগালাম আরও অন্ধকার খোলা জায়গার উদ্দেশ্যে।

সে এক রোমাঞ্চকর হাঁটাপথ বটে! মনে হচ্ছে আঠারো শতকের কোন অজ পাড়াগাঁয়ের অন্ধকার বরফ-প্রান্তরে এসে পড়েছি। জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই। বরফ-ঢাকা পথের দু'ধারে জঙ্গল। একমাথা তারার আলো। আওয়াজ বলতে নিজেদের মৃদু বাক্যবিনিময় আর দূর থেকে ভেসে আসা স্নো ডগদের অবিশ্রান্ত ঘেউ ঘেউ ডাক। রাস্তার দু'ধারে ডাঁই করা বরফের স্তূপ।

বরফ ও অন্ধকারে ঘেরা রাস্তায় ট্রাইপড-ই পথের সাহারা ।

গাইড চলেছেন আগে আগে। বেশ জোরে হাঁটেন দেখছি। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "অরোরার আলো সম্বন্ধে কিছু জানা আছে কি?" সবাই যে যার সাধ্যমতো জ্ঞান বিতরণ করলাম। উনি বললেন সবুজ আর লাল আলোটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ট্রমসো থেকে। সবুজটাই বেশি, তার মূলে আছে বাতাসের অক্সিজেন। ক্রিস্টিয়েনসেন ওঁর দীর্ঘ গাইড জীবনে মাত্র ক'বার নীল এবং বেগুনি-হলুদ আলো দেখেছেন। অরোরা প্রথমে খুব হালকা হয়ে পুব থেকে পশ্চিম ছেয়ে ফেলে। তারপর চলতে থাকে আলোর নানা খেলা, যা অরোরা ডিসপ্লে নামে পরিচিত।

আমরা বেশ মনোযোগ দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ওঁর কথা শুনছি, হঠাৎ উনি সামনে সোজা তাকিয়ে বললেন, "সরে দাঁড়াও রাস্তা থেকে। স্লেজ ডগগুলো আসছে।" উনি তো বলেই খালাস, এখন সরব কোথায় বাপু! যে বরফের স্তূপ! মুহূর্তমধ্যে নিস্তব্ধ চরাচর খানখান করে ছুটে এল পাহাড়ি জংলি অথচ ট্রেণ্ড কুকুরের পাল। গায়ে অসম্ভব বোঁটকা গন্ধ। স্লেজপিছু দুটো করে কুকুর। মানুষও দু'জন। একজন বসে আছে, আর একজন কুকুরের গলার রশি ধরে পিছনে দাঁড়ানো। স্লেজের পিছনে ঝুলছে একটা করে টিমটিমে বাতি। সম্মিলিত কুকুরের লাগাতার চিৎকারে কানে তালা ধরে গেল। অবশ্য ক্ষণিকের শোরগোল। স্লেজসহ কুকুরগুলো গায়েব হতেই আবার নিস্তব্ধতায় ভরে গেল চরাচর। এতক্ষণ স্লেজগাড়ির মৃদু আলোকে উদ্ভাসিত ছিল পথ, আবার গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল।

শুরু হল হাঁটা। আবছা তারার আলোয় চোখ সয়ে এসেছে। যে জায়গায় এসে পৌঁছলাম সেটা একটা পাহাড়-ঘেরা উপত্যকা। গাইড একমনে আকাশ দেখছেন। আমরাও। আকাশের উত্তর কোণ বরাবর আঙুল তুলে বললেন, কিছু একটা ফুটে উঠছে সেখানে। আমার স্বামীকে ট্রাইপডে

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

ক্যামেরা লাগাতে বললেন। আমি কিন্তু সে জায়গায় চোখ চালিয়ে কিছু সাদা-সবজেটে ছোপ ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। আর অমনি — এই না হলে মাহেন্দ্রক্ষণ! — ঝিরিঝিরি বরফ বৃষ্টি শুরু হল। এইমাত্র আকাশ পরিষ্কার ছিল, আবার এই তারা ঢাকা মেঘ!

উর্ধ্বমুখো উট দেখেছ, উর্ধ্বমুখো উট?/ আকাশপানে ঠায় তাকিয়ে মেজাজটা কুটকুট। এরকম অবস্থায় এক সময় শুনি ক্রিস্টিয়েনসেন বলছেন, "ধৈর্যটাই বড় কথা। অরোরা এখন খুব দুর্বল। সাধারণত তিন রকমের অরোরা হয়। শান্ত (calm), নৃত্যপর (active) আর কম্পমান (pulsating)। সবথেকে বেশি দেখা যায় শান্ত অরোরা। যেন অনেকটা আকাশ ব্যেপে এক রঙিন পর্দা ঝোলানো। খুব লম্বা এই অরোরার আলো ধীরে ধীরে দিগন্ত অবধি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পালসেটিং অরোরা অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন। দপদপিয়ে জ্বলে আর নেভে। আর কখনও অরোরা হয় অ্যাকটিভ। এই আলো আকাশ জুড়ে নৃত্য করে। কখনও বাঁক নেয়, কখনও কোঁকড়ানো, কখনও ভাঁজ হয়ে দুলতে থাকে।"

গাইডের কথা শুনছি আর ছোপধরা আকাশের দিকে তাকাচ্ছি। তিনটের একটাও নয়। গাইড বলে চলেছেন, "কখনও কখনও অরোরা এত স্ট্রং হয় যে, আশেপাশের বস্তুর ছায়া পড়ে মাটিতে। ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।"

গাইডের কথার পিঠে একজন বলল, "কিন্তু আজ তো খুব উইক!"

গাইড তার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "তুমি ভুল বলছ। এখন, এই মুহূর্তে উইক। দশ সেকেণ্ড পরে কী হবে তা তুমি জানো না। কেউ জানে না।"

উর্ধ্বমুখে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হল না। গাইড কাছে এসে বললেন, "আলো এখন ভীষণ উইক। চলো সব। আমরা আমাদের ক্যাম্পে পৌঁছই।"

একটা খোলা বড় চত্বরের ঠিক মাঝখানে একটা বেশ বড় গোছের গোলাকৃতি তাঁবু। আশেপাশে আরও গুটিকতক তাঁবুর মতো আস্তানা। মাঝেরটাই সবচেয়ে বড়। তাঁবুর দেওয়াল তৈরি হয়েছে বিশেষ ধরণের মোটা কাপড়ে। মাঝে মাঝে কাঠের সরু পাটাতন আর চূড়ায় খানকতক কাঠের ঝুটি বাঁধা। তীব্র হাওয়া সামলাবার জন্যই কাঠ দিয়ে শক্তপোক্ত করে দেওয়াল বাঁধা হয়েছে। ভেতরে মৃদু আলো জ্বলছে বোঝা যাচ্ছে। গাইড কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। পেছনে হারাধনের ফৌজ। ওমা, ঢুকেই মনটা ভাল লাগায় ভরে গেল। কী মিষ্টি গন্ধ আর কেমন ওম! কাঠের পাটাতন পাতা মেঝে। বড় বড় লম্বা-লম্বা কাঠের বেঞ্চি-টেবিল পাতা। তাতে সুন্দর করে ন্যাপকিন স্পুন সাজানো। মাঝে মোমবাতি। তাঁবুর মধ্যিখানে ফায়ারপ্লেসে বেঁটে বেঁটে মোটা মোটা কাঠের লগ জ্বলছে। হালকা ধোঁয়া। ওই ধোঁয়ারই মিষ্টি গন্ধ নাকি! এক কোণে বেশ বড়সড় মাটির ঢিবির উনান জাতীয় বানানো। কয়েকজন বসে চা-কফি বা অন্য কিছু পান করছে। সাড়াশব্দ নেই। গাইড আমাদের বুঝিয়ে বললেন, "স্যামিরা ছল এ অঞ্চলের আদিম উপজাতি। এদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল ও প্রকৃতিনির্ভর। মাছ আর রেনডিয়ারের মাংস ছিল এদের প্রধান খাদ্য। প্রকৃতির মাঝে পাহাড়ের কোলে বেড়ে উঠত এরা। ঝরনার জলে তৃষ্ণা মেটাত আর জঙ্গলের নানা জড়িবুটি ছিল এদের বিপদআপদের ভরসা।"

হাড়কাঁপানো বরফের প্রান্তরে উষ্ণ তাঁবুর আমন্ত্রণ

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

গাইডের গল্প বলার ঢঙে যেন দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলাম মাথার লম্বা লম্বা চুলে নানা রঙের পালক গুঁজে স্যামিরা মেরুভল্লুকের লোম থেকে তৈরি লম্বা ভারী পোশাক চড়িয়ে অস্ত্র হাতে ছুটে বেড়াচ্ছে জঙ্গলে পাহাড়ে উপত্যকায়। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে সবুজ-লাল-নীল আলোয় ভেসে গেল আকাশ, বরফ-উপত্যকা, দিগন্তবিস্তৃত নির্জন প্রান্তর। তখন কী প্রতিক্রিয়া হত ওই সরল অশিক্ষিত মানুষগুলোর! তখনই শুনি গাইড বলছেন, "স্যামিরা কিন্তু এই অরোরার আলোকে ভয় পেত। এরা বিশ্বাস করত এ নেহাতই কোনও অশুভ শক্তির রাগের প্রকাশ। এড়িয়ে চলত। এরা মনে করত কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দেখালে মৃত্যু অনিবার্য।"

গল্প শুনতে শুনতে আবার কখন বাইরে এসেছি। গাইড সবাইকে স্পট জগিং করতে বললেন। বরফে ঢাকা খোলা প্রান্তরে একসঙ্গে এতগুলো ঘণ্টা কাটানো সোজা নয়। বরফের কামড় একবার ধরলে রক্ষা নেই। পা জমছিল একটু একটু করে। অরোরা যে-কে সেই। অন্ধকারে আমরা ক'জন তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছি। তখন গাইড প্রস্তাব দিলেন, "আমি ঝরনা থেকে জল আনতে যাচ্ছি। বরফ ভেঙে হাটতে হবে এক কিলোমিটার। এই ঝরনার জল শুধু সুস্বাদুই নয়, অত্যন্ত পুষ্টিকর। মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতেও কখনও জমে না। তোমরা আমার সঙ্গে আসতে পারো।" দলের সবাই, এমনকি আমার মেয়ে এবং স্বামীও দেখলাম একবাক্যে রাজি। অগত্যা দুর্বল অরোরার স্বাস্থ্যকামনা ছেড়ে, তুড়ুক নাচ শিকেয় তুলে বেরিয়ে পড়া হল।

কী মিশকালো অন্ধকার রে বাবা! লাইন দিয়ে চলেছি। বাতি বলতে একজনের হাতে একটা টিমটিমে টার্চ আর আমার স্বামীর মাথায় একটা বাতি বসানো ফেট্টি। নিঃসীম শূন্যতা চারিধারে। তারার আলোয় চোখ সইছে ক্রমশ। সাদা স্তূপীকৃত বরফের চাদরে ঢাকা উপত্যকা বেশ দেখাচ্ছে। কাছে দূরে যা মালুম হয় কেবল পাহাড়ের যুথবদ্ধ শ্রেণি আর ন্যাড়া গাছের সিল্যুট। কিছুদূর বেশ চললাম। হঠাৎ দেখি পা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত বরফে ঢুকে যাচ্ছে। প্রমাদ গুনলাম। গাইড ওই বরফে দৌড়ে দৌড়ে, বেশ কিছুটা এগিয়ে রাস্তা বানালেন। বললেন, "আমার পায়ে চলা রাস্তা ধরে এসো।" বলা সহজ। কিন্তু অন্ধকারে কী করে যে ওঁর পায়ে চলা রাস্তা ঠাহর হবে সেটা পরিষ্কার হল না। সম্বল বলতে দু'টি মাত্র আলো। তাও আবার সার বেঁধে চলেছি বলে লম্বা ছায়া পড়ছে সামনে। ত্রিনয়ন হয়েও স্বামী বেচারা সুবিধে করতে পারছে না কিছুই। হাতে আবার ট্রাইপড! ব্যাপার দেখে গাইড মশাই আবার বরফ ভেঙে থপ থপ করে পিছনে এলেন এবং একহাতে ক্যানেস্তারা অন্য হাতে আমাকে বগলদাবা করে সামনে নিয়ে গেলেন। বাঙালিকন্যার পক্ষে নরওয়েজিয়ানের পদচিহ্নে পা রাখা যে কী দুর্বিষহ, তা যে না চেষ্টা করেছে বুঝতে পারবে না। শেষে চলতি পথে যত গাছপালা আসতে লাগল তাদেরই পেট কোমর জাপটে ধরে ধরে টাল সামলে চলতে লাগলাম। ওই বিষম ঠাণ্ডাতে খোলা প্রান্তরেও বুঝলাম ঘেমে উঠছি। মনে বড় দুঃখ হতে লাগল। সেই বিকেল পাঁচটা থেকে কী না করছি। কোথায় আকাশভরা আলো দেখে নয়ন জুড়োব, তা না ঝরনাতলার জল আনতে কালঘাম ছোটাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য মনের গ্লানি দূর হল আবছা কুলু কুলু ধ্বনিতে।

ক্যাম্পে ফিরে দেখি বেশ জমজমাট ব্যাপার।

(ক্রমশ)

ছবি: কান্তি কুমার ও সোহিনী কুমার

প্রথম প্রকাশিত: 'দেশ' পত্রিকা, ১৭ মে ২০১১

Click here to sign up

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com